বর্ষ ১ সংখ্যা ১ মে ২০১৪

প্রান্তজন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সনদ (ইআইডিএইচআর)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় সেড প্রকাশিত বার্ষিক নিউজলেটার

সূচি

ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে না চা শ্রমিকেরা
চা বাগান পরিদর্শনকালে বলেন ইইউ দূত

প্রকল্প: বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহ সাংবিধানিকভাবে ও পরিসংখ্যানগতভাবে অদৃশ্য
—*ড. হোসেন জিল্লুর রহমান*

চা শিল্প: মালিকের সৌভাগ্য, শ্রমিকের দুর্দশা

চা বাগানের লাইন চৌকিদার শ্যাম সুন্দরের জীবন

সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিক নির্যাতন প্রতিরোধ বাংলাদেশের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রধান চ্যালেঞ্জ

একটি উচ্ছেদ ডিক্রি, তার বাস্তবায়ন এবং সাতটি মাহালে পরিবারের দুর্ভাগ্য

দিনাজপুরে সান্তাল গ্রামে হামলা

চন্দনা ভুঞ্জর: এক কাদর নারীর প্রান্তিক জীবন

নোটিশ বোর্ড

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
আসফারা আহমেদ এবং মো. আশরাফুল হক

এ নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে সেড পরিচালিত "বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পের আওতায়। পার্টনার: গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। সহযোগী সংগঠন: জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাগানিয়া এবং মৌলভিবাজার চা জনগোষ্ঠী ফ্রন্ট।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
১/১ পল্লবী (৫ম তলা), মিরপুর
ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২-৯০২৬৬৩৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে না চা শ্রমিকেরা
চা বাগান পরিদর্শনকালে বলেন ইইউ দূত

ছবি: সায়দুর রহমান

আলীনগর চা বাগানের একটি লেবার লাইনের চা সম্প্রদায়ের মাঝে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূত উইলিয়াম হানা।

"এটা খুবই অন্যায় যে বাংলাদেশের চা শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরী পাচ্ছে না। এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়," বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দূত উইলিয়াম হানা গত ১৭ মার্চ শ্রীমঙ্গলে চা শ্রমিক প্রতিনিধি ও চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে এক বৈঠকে একথা বলেন। হানা চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠী সংক্রান্ত একটি প্রকল্প পরিদর্শন করতে শ্রীমঙ্গল যান। প্রকল্পটি পরিচালনা করছে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)। প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইআইডিএইচআর এবং ইকো কোঅপারেশন নেদারল্যান্ডস।

"মানুষ তাদের কাজের বিনিময়ে ন্যায্য মজুরি পাবে না, এটা খুবই অন্যায়। এটা ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি বলবো, না, আমি সন্তুষ্ট নই। এটা অত্যন্ত অন্যায়। আমি ঢাকায় ফিরে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এবং কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরির সাথে কথা বলবো, তাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, আপনাদের দেশে এ কেমন অবিচার চলছে?" অ্যাম্বাসাডর উইলিয়াম হানা বলেন। সভায় চা শ্রমিক নেতা, বাগান মালিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদকরা। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রোজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

"ইউরোপীয় ইউনিয়নকে কেন একথা বলতে হচ্ছে? কারণ আমরা সারা পৃথিবীতে ন্যায়বিচার চাই। বাংলাদেশের অন্যায্য মজুরীর বিষয়টি অন্যান্য দেশের তুলনায় খারাপ। আমি আফ্রিকায় তানজানিয়ায় কাজ করেছি, ক্যামেরুনে কাজ করেছি; তাদের শ্রমিকদের অবস্থা দেখেছি। বাংলাদেশের শ্রমিকদেরকে তাদের তুলনায়ও কম সুযোগসুবিধা দেয়া

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

হয়। চা শ্রমিকরা এত কম টাকা মজুরি কেন পাবে, এ বিষয়টা আমার একেবারেই বোধগম্য নয়," হানা বলেন। বৃটিশ উপনিবেশকরা চা শ্রমিকদের শোষণের ব্যবস্থা করে রেখে গেছে, অনেকের এই মন্তব্যের উত্তরে হানা বলেন, "আপনারা কি এখনও বৃটিশ আমলে পড়ে থাকতে চান?" চা শ্রমিকরা যেন ন্যায্য মজুরী পায় এবং সন্তানদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারে, উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা পায় এবং সর্বোপরি সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। চা বাগান এলাকায় পর্যটন সম্ভাবনা নিয়েও তিনি কথা বলেন। অ্যাম্বাসাডর জানান, সেদিন সকালে তিনি বাইক্কা বিল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে অন্তত ২০ প্রজাতির পাখি দেখেছেন। এই এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মত দেন। "বঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলোর জীবনমান উন্নত হলে তারা একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ভূমিকা রাখবে, এবং সেটা সবার জন্যই মঙ্গল বয়ে আনবে," উইলিয়াম হানা যোগ করেন।

সেডের পরিচালক ফিলিপ গাইনের সঞ্চালনায় সভায় আরও বক্তব্য রাখেন চা ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রামভজন কৈরি ও বিজয় বুনার্জী, চা বাগান মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন সিলেট শাখার সভাপতি মোহাম্মদ শিবলি, প্রোজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (পিডিইউ) এর পরিচালক হারুন অর রশিদ, ইকো কোঅপারেশনের প্রোগ্রাম অফিসার হাসনা হেনা, প্রাক্তন বাগান ম্যানেজার নাসিম আনোয়ার প্রমূখ।

সভা শেষে চা জনগোষ্ঠীর জীবনমান স্বচক্ষে দেখতে অ্যাম্বাসাডর আলীনগর চা বাগানের একটি লেবার লাইন পরিদর্শনে যান। সেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হয়।

চা শ্রমিক ও তাদের জনগোষ্ঠী হল বাংলাদেশের সবচাইতে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন মানুষ। চা বাগানেই আটকা পড়েছে তাদের জীবন। বাংলাদেশের চা শ্রমিকদের বঞ্চনার বিষয়টি বোঝা যায় দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের চা শ্রমিকদের মজুরির সাথে তাদের মজুরির তুলনা করা হলে। বাংলাদেশে যখন দৈনিক মজুরি মাত্র ৬৯ টাকা, শ্রীলংকায় একজন চা শ্রমিক পায় ৫৫০ রুপি (প্রায় ৩২৮ টাকা), যা বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ৫ গুণ বেশি।

"বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পটি দেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় চা উৎপাদনকারী এলাকা, এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রায় ১১ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় আসবে (যাদের মধ্যে ৬ লক্ষ মানুষ চা জনগোষ্ঠীর এবং ৫ লক্ষ স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত)।

মোঃ আশরাফুল হক

শ্রীমঙ্গলে আলোচনা সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন ইইউ দূত উইলিয়াম হানা। ছবিঃ সাইদুর রহমান

প্রকল্প

বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) পরিবেশ ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে। "বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি" প্রকল্পটি ২০১৩ সালের মে মাসে শুরু হয়েছে। তিন বছর মেয়াদী এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের সাথে এক অংশগ্রহণমূলক গবেষণায় যুক্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

চা বাগানের শ্রমিক এবং লেবার লাইনে 'বাঁধা' তাদের জনগোষ্ঠী হল বাংলাদেশের সবচাইতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। চুক্তিবদ্ধ চা শ্রমিকদের বংশধর এ মানুষগুলো দেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাধারণত এদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের মধ্যে ৬০টির মতো গোষ্ঠী রয়েছে যারা স্বল্প-পরিচিত অথবা মূল জনগোষ্ঠীর কাছে একদমই অপরিচিত। সক্ষমতা বঞ্চনার কারণে এ গোষ্ঠীগুলোর দুর্ভোগ আর কাঠামোগত নিপীড়ন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

অংশগ্রহণমূলক তথ্য তালাশ, অনুসন্ধান, জরিপ, গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে চূড়ান্ত উপকারভোগীদের মজুরি, কর্মপরিবেশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, নারী ও শিশুর বিপন্নতা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ে যেসব তথ্য ও জ্ঞান তৈরি হবে তা প্রকাশিত হলে এসব ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার একটি চিত্র পাওয়া যাবে। গবেষণার ফলাফল প্রচারের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ও সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের সচেতনতাও বৃদ্ধি পাবে।

প্রকল্প এলাকা: বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চা বাগান; উত্তর-মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং যেখানে চা-শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র **জাতিসত্ত্বাগুলো** বসবাস করে।

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী: স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, তরুণ সমাজ, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন, মানবাধিকার কর্মী, স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রম অধিদপ্তর, চা বাগান মালিক এবং গণমাধ্যম।

চূড়ান্ত উপকারভোগী: চা শ্রমিক ও তাদের প্রায় ছয় লাখ মানুষের জনগোষ্ঠী এবং স্বল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহ, তাদের নারী, শিশু ও তরুণ সমাজের প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ।

প্রধান প্রধান কার্যক্রম: গবেষণা, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান ও ম্যাপিং; প্রকাশনা, তথ্যচিত্র নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি ও অন্যান্য প্রোডাকশন; আন্তর্জাতিক সনদ ও জাতীয় আইন বিশ্লেষণ; প্রশিক্ষণ, সংলাপ, কনভেনশন ও সাংস্কৃতিক উৎসব আয়োজন; ক্যাম্পেইন, অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং এবং শিক্ষামূলক কাজ; এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের অবস্থা, সমস্যা এবং প্রয়োজন তুলে ধরতে চূড়ান্ত উপকারভোগীদের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক এজেন্ডা প্রণয়ন।

এটি একটি অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মূল প্রতিষ্ঠান সেড, পার্টনার গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, এবং চূড়ান্ত উপকারভোগীদের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাসোসিয়েট প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও চূড়ান্ত উপকারভোগীরা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করবে।

স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহ এবং তাদের বসবাসের এলাকা (চা বাগানের বাইরে)

এলাকা	জাতিসত্ত্বা	জনসংখ্যা
উত্তর-মধ্যাঞ্চল: ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, জামালপুর এবং শেরপুর জেলা	হাজং, কোচ, বানাই, ডালু, হদি, শবর, রাজবংশী/বংশী, গুর্খা।	স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বা-সমূহের সঠিক জনসংখ্যা জানা অত্যন্ত কঠিন। বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া যায়। এক একটা গোষ্ঠীর সংখ্যা ১০০'র কম থেকে ৬০,০০০ পর্যন্ত।
উত্তর-পশ্চিম: রাজশাহী, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, দিনাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, বগুড়া এবং পঞ্চগড় জেলা	বাগতি, ভুইমালি, ভুইয়া, ভূমিজ, ভোজপুরি, গণ্ডো/গঞ্জু, ঘাটুয়াল, হরি, হাজরা, হো, কদর, কর্মকার, খারিয়া, কোদা, কুর্মি, মাহলে, লোহার, মালো, মুরিয়ার/মুণ্ডা, মুশহর, পালিয়া, রামদাস, রবিদাস, রাই, রাজবংশী/বংশী, রাজোয়াড়, রাউতিয়া, শিং, তাঁতী/তন্তুবাই, তেলেগু, পাটনি, গড়াইত, কোল, কোচ, মুণ্ডা, পাহাড়িয়া, তেলি, তুরি ইত্যাদি।	

চা উৎপাদন এলাকা এবং চা বাগানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী

জেলা	উপজেলা	ভ্যালি	চা বাগানের সংখ্যা	জাতিসত্ত্বা
সিলেট	সিলেট সদর, জৈন্তাপুর, ফেঞ্চুগঞ্জ, গোয়াইনঘাট ও কানাইঘাট	সিলেট	১৯	বাড়াইক, বিহারি, পাহান, তেলেগু, বানাই, বাউরি, মুণ্ডা, বীন, ভুজপুরি, ভূমিজ, বোনাজ চৌহান, গণ্ডো/গঞ্জু, গুর্খা, গারো, সান্তাল, ওরাও, খাড়িয়া, কন্দ, মাদ্রাজি, মুশহর, নায়েক, নুনিয়া, উড়িয়া, পানিকা, বাঁশফোর, কৈরি, বাকতি, কালিন্দি, রাউতিয়া, গোয়ালা, গড়, রাজভর, মৃধা, মাহলে, পাত্র, শব্দকর, পাহারি, তেলি, পাশি, দোষাদ, রবিদাস, তাঁতী/তন্তুবাই ইত্যাদি।
মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, রাজনগর ও বড়লেখা	জুরি, লংলা, মনু-ডলই ও বালিশিরা	৯০	
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট, বাহুবল, মাধবপুর ও নবীগঞ্জ	লস্করপুর	২৩	
চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি, রাঙ্গুনিয়া, বাঁশখালি ও পটিয়া	চট্টগ্রাম	২২	
রাঙামাটি	কাপ্তাই	চট্টগ্রাম	১	
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর		১	

দ্রষ্টব্য: চা বাগান ও অন্যান্য এলাকার স্বল্প-পরিচিত ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের তালিকা করা হয়েছে বিভিন্ন বইয়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এবং কমিউনিটিগুলোর সাথে আলোচনা করে। এ সংক্রান্ত আরও তথ্য দিয়ে কেউ সাহায্য করতে চাইলে আমরা তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশের অধিকাংশ স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহ সাংবিধানিকভাবে ও পরিসংখ্যানগতভাবে অদৃশ্য—ড.হোসেন জিল্লুর রহমান

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং আলোচক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। (বা থেকে সামনের সারিতে) অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, লিওনার্ড জেলেস্ট্রা ও ফিলিপ জ্যাকস। (পেছনের সারিতে বা থেকে) পরিমল সিং বরাইক, মোয়াজ্জেম হোসেন, অনিল মারান্ডি, রামভজন কৈরী এবং ফিলিপ গাইন। ছবি: মো: সায়দুর রহমান।

“বাংলাদেশের অধিকাংশ স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহ সাংবিধানিকভাবে ও পরিসংখ্যানগতভাবে অদৃশ্য। এই অদৃশ্যমানতা দূর হলে তাদের জন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দাবি করাটা সহজ হবে।”

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)-এর আয়োজনে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ (রবিবার) ঢাকায় সিবিসিবি সেন্টারে “বাংলাদেশের চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনারে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এ কথা বলেন।

সেমিনারে বাংলাদেশের মূল জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বার মানুষের বঞ্চনা, দুর্ভোগ, স্বীকৃতির অভাব ও কাঠামোগত নিপীড়ন বিষয়ক তথ্য ও অর্ন্তদৃষ্টি বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এবং আলোচক হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের কোঅপারেশন প্রধান ফিলিপ জ্যাকস; ইউল্যাব-এর ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম; ইকো কোঅপারেশন বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ লিওনার্ড জেলেস্ট্রা; এবং পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান।

প্রধান অতিথির ভাষণে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, “বাংলাদেশে অনেক জাতিগোষ্ঠী আছে যারা নিজেদেরকে বাঙালি বলে না। এসব স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহকে ভালোভাবে না জানলে আমরা ঐ সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ঘটাতে পারবো না। আর তাদের উন্নয়ন ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।” তিনি বাংলাদেশের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে পরিচিত করার ক্ষেত্রে সেডে'র এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ডেলিগেশনের হেড অফ কো-অপারেশন ফিলিপ

ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমুহের মধ্য থেকে অংশগ্রহণকারীগণ। ছবি: সাইদুর রহমান

জ্যাকস বলেন, “প্রকল্পটিতে কার্যকরী গবেষণা ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি এ দুটি বিষয়ের চমৎকার সমন্বয় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে আমরা সবাই এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবো।”

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে সেড-এর সাধারণ সম্পাদক ফিলিপ গাইন জানান, প্রতিবেশী দেশ শ্রীলংকার চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫৫০ রুপি হলেও বাংলাদেশে মাত্র ৬৯ টাকা। তিন বছর আগেও (২০০৯ সাল নাগাদ) মজুরি ছিল ৩২.৫০ টাকা। বাংলাদেশে স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের দুর্দশার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি জানান, বাংলাদেশে পঞ্চাশের অধিক জাতিসত্ত্বার মানুষ রয়েছে যারা শিক্ষা ও ভূমির প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত। তিনি আরও বলেন, “চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের সুরক্ষায় আমাদের সকলের সচেতনতা বাড়ানো দরকার।”

সেমিনারে প্রায় ৪৫টি স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, উন্নয়নকর্মী এবং সাংবাদিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহ ও তাদের সংগঠনগুলোকে নিয়ে গবেষণা ও তাদের সক্ষমতা তৈরিতে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল উন্নয়নে কীভাবে কাজ করা যায় সে বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

চা জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাংলাদেশের সবচে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষগুলোর অন্যতম। শ্রমিকদের জীবনচক্র চা বাগানের লেবার লাইনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। দেশের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন ও বংশ পরম্পরায় চুক্তিবদ্ধ চা শ্রমিকদের উপস্থিতি অত্যন্ত নগন্য। সমতল ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ৬০টির অধিক স্বল্প-পরিচিত বা অদৃশ্য জাতিসত্ত্বা রয়েছে যারা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বর্হিবিশ্বের কাছেও অপরিচিত।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশন বাংলাদেশ-এর সহায়তায় তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প ‘বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’। চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের পরিচিতি সুনির্দিষ্ট করা, তাদের অধিকার ও দাবি তুলে ধরা এবং সক্ষমতা তৈরি করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৩ সালের মে মাসে প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। *মো: আশরাফুল হক*

চা শিল্প: মালিকের সৌভাগ্য, শ্রমিকের দুর্দশা

“চা শ্রমিকদের বঞ্চনার মুলেই রয়েছে শ্রম আইন” বলছিলেন রামভজন কৈরী। সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) আয়োজিত একটি আবাসিক কর্মশালায় তিনি একথা বলেন। “চা শ্রমিকের অধিকার নিয়ে পুর্নভাবনা” শিরোনামে ৮ থেকে ১১ ফ্রেরুয়ারি পর্যন্ত ৪ দিন ব্যাপী এই কর্মশালাটি মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই ছিল যুবক শ্রেণীর যারা বিভিন্ন চা শ্রমিক সম্প্রদায় থেকে আগত। কর্মশালাটিতে মোট ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছিল।

কর্মশালাটির মুল উদ্দেশ্য ছিল চা শ্রমিক ও তাদের সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা কাজে অংশগ্রহণ ও প্রতিবেদন লেখার উপরে অংশগ্রহণকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

একজন শ্রমিক নেতা ও সেড-এর কর্মী কৈরী বলেন, আইন অনুসারে সব শিল্পের শ্রমিকরাই ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পায় যা চা শ্রমিকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। পাশাপাশি চা শ্রমিকরা প্রতি ২২ কর্মদিবসের বিপরীতে বৎসরে ১ দিন ছুটি পায় যেখানে অন্য শিল্পের শ্রমিকরা পায় ১৮ দিনে ১ দিন।

চা শ্রমিকদেরকে আইনগত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা থেকে কৌশলপুর্ণভাবে দুরে রাখা হয়েছে। এ বিষয়ে কৈরী বলেন, “একজন শ্রমিককে তার আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য চট্টগ্রামে অবস্থিত শ্রম আদালতে যেতে হয় যা স্বল্প আয়ের একজন শ্রমিকের জন্য অনেকটাই অসম্ভব” তিনি আরো বলেন, “রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কিংবা রাষ্ট্র কেউই চা শ্রমিকদের এই কৌশলগত বঞ্চনার প্রতি সচেতন নয়। এটি অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে সরকার চা শ্রমিকের মত এত বড় একটি শ্রমিক সংগঠনের জন্য কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেনা।” পরিমল সিং বরাইক সহ আরো অনেক শ্রমিক নেতা চা শ্রমিকদের এই দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার অবসান সম্পর্কে দৃঢ় বক্তব্য প্রদান করেন।

যখন শ্রম আইনই চা শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে ঠিক তখনই মালিক শ্রেণীও তাদের প্রতি আইনত বাধ্যবাধকতা পূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে। মালিক শ্রেণীর এই উপেক্ষা করার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সিলেট বিভাগের শ্রম পরিদর্শক দেলোয়ার হোসাইন বলেন, “আমরা দেখতে পাই যে চা বাগানের মালিকরা তাদের শ্রমিকদের কোনো ধরনের নিয়োগপত্র দেয় না। এটি আইনত অবৈধ, ফলে আমরা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বলছি তারা যেন তাদের শ্রমিকদেরকে নিয়োগপত্র প্রদান করে।”

অংশগ্রহণকারীরা, সরকারি কর্মকর্তা, চা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, গবেষক এবং চা বাগান কর্মকর্তা সকলেই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চা সম্প্রদায় এবং চা শিল্পে তাদের নিজস্ব অর্ন্তভূক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত ব্যক্ত করেন।

তথ্য বিনিময় ও গবেষকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহনের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীরা এই প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ এবং প্রতিবেদন লিখার উপর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রত্যেকেই ছোট ছোট দলে

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ।

পুষ্টিহীনতায় ভোগা একজন চা শ্রমিক। ছবি: ফিলিপ গাইন

বিভক্ত হয়ে ৫টি চা বাগানের কতগুলো লেবার লাইন পরিদর্শন করেন। প্রতিটি দল পঞ্চায়েতের (চা শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনার জন্য একটি নির্বাচিত প্রতিনিধি দল) সাথে একটি এফ জি ডি পরিচালনার মাধ্যমে চা সম্প্রদায়ের মিশ্রণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নকশাকৃত একটি প্রশ্নপত্র পূরণ করেছে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে একজন চা শ্রমিকের ইন্টারভিউ নিয়েছে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবন প্রণালী ও ভূমিহীনতার মত বিষয়ে প্রতিবেদন লিখেছে।

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (ডেপুটি ডিরেক্টর অব লেবার, ডিডিএল, ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কাঠামো ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি চা শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে তার নিজস্ব কিছু পরিদর্শনের কথা বলেন। তিনি বলেন, শ্রম আইন চা শ্রমিকদের অনেক অধিকার নিশ্চিত করে কিন্তু এগুলো কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রমিকরা খুবই কঠিন জীবন যাপন করে। সুপেয় পানির অভাব, অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ও আবাসন এই সমস্ত বিষয়গুলো লেবার লাইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গিয়াসউদ্দিন বলেন, "চা শ্রমিকদের বঞ্চিত করার প্রবণতা ব্রিটিশ কোম্পানির সময় থেকে চলে আসছে যারা শ্রমিকদেরকে সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে এসে প্রতারিত করেছে।" নিজস্ব পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে শ্রমিকদের বঞ্চনার ব্যাপারে তিনি বাগান কর্তৃপক্ষকে আংশিক দায়ী করে বলেন, "চা বাগান ব্যবস্থাপকরা নানাভাবে অনেক অর্থ উপার্জন করে থাকেন কিন্তু তারা কোনো আইন জানেন না।" তিনি শ্রমিকদের বঞ্চনার ব্যাপারে তাদের দাবিগুলো উত্থাপনের বিষয়ে শ্রমিক নেতাদের ব্যর্থতাকেও দায়ী করে বলেন "মালিকদের বিপক্ষে কোনো ধরনের মামলা কখনোই খুজে পাওয়া যায় না।"

আলোচনাটি একপর্যায়ে অনেক বেশি উত্তেজনাপুর্ণ হয়ে উঠে যখন একজন অংশগ্রহণকারী ডিডিএল কে প্রশ্ন করে যে, "যখন চা শ্রমিক সংগঠনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে তাদের কার্যালয় থেকে বের করে দিয়ে সরকার সেই কার্যালয়ে তালা দিয়ে চাবি নিয়ে যায় তখন শ্রমিকরা কোথায় গিয়ে তাদের দাবি তুলে ধরবে?" এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে চা শ্রমিক সংগঠনের একমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালে। কিন্তু ২০০৯ সালে সেই প্রতিনিধিদেরকে জোর পূর্বক তাদের কার্যালয় থেকে বের করে দিয়ে সরকার সমর্থিত একটি কার্যত কমিটি সেখানে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। পরবর্তীতে চা শ্রমিকদের দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার সেই কার্যালয় খালি করে দেয়ার পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয় যা আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি।

প্রত্যুত্তরে ডিডিএল একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে তার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেন এবং বলেন যে যদি তিনি সরকারি নির্দেশনা পান তবে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রকাশ কান্তি চৌধুরী (এডিসি, রাজস্ব, মৌলভীবাজার) বলেন, চা শ্রমিক ও তাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে, ২০১০ সাল থেকে কমপক্ষে ৪০টি বিদ্যালয় মৌলভীবাজার জেলার চা বাগানগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও সব বাগানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ঘরবাড়ীর সুযোগ সুবিধা সন্তোষজনক নয় তথাপি সরকার এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করছে। এডিসি বলেন, "একটি সময়ে আমাদের (প্রশাসনিক কর্মকর্তগণ) চা বাগান ব্যবস্থাপকদের সাথে খুব কম সাক্ষাৎ হত। কিন্তু বর্তমানে তাদেরকে দলিলপত্র নবায়নের জন্য আমাদের কাছে আসতে হয় ফলে তারা শ্রমিকদেরকে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে তা সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি" তিনি আরো বলেন, "২০১২ সালের প্রস্তাবিত চা নীতিমালায় চা বাগান কর্তৃপক্ষ যেন চা শ্রমিকদেরকে কমপক্ষে ২টি কক্ষ ও ১টি বারান্দা বিশিষ্ট ১টি ঘরের পাশাপাশি পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন ও শিক্ষা সুবিধা প্রদান করে এ বিষয়ে আমরা সুপারিশ করেছি।"

চা শ্রমিকরা যে জমির উপর ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বসবাস করছে সেখানে তাদের বৈধ দাবি ও মালিকানা প্রদানের বিষয়ে সরকারের কোনো নীতমালা বা চিন্তাভাবনার বিষয়ে একজন অংশগ্রহণকারীর প্রশ্নের উত্তরে মি. চৌধুরী বলেন, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য ভূমি, শ্রম ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সহযোগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির একত্রে বসা প্রয়োজন।

একই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে কালিন্দি চা বাগানের ব্যবস্থাপক রবিউল হাসান সকলকে সর্তক করার মাধ্যমে বলেন, যদি চা শ্রমিকদেরকে এই সমস্ত জমির মালিকানা দেয়া হয় তাহলে তারা চা শিল্পের জন্য কাজ করা বন্ধ করে দিবে। চা সম্প্রদায়রা অতীতের চেয়ে অনেক ভালো আছে দাবি করে তিনি বলেন "অতি শীঘ্রই এমন সময় আসবে যে চা বাগানে নিরক্ষর কোনো মানুষ থাকবেনা।"

বাংলাদেশ চা বোর্ড এর প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট ইউনিট এর ডিরেক্টর মো: হারুন-আর-রশীদ বলেন, চা বাগানের মালিকরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে থাকে। যদি তারা এই মুনাফা থেকে আরো কিছু অর্থ শ্রমিকদের পেছনে ব্যয় করত তাহলে তা এই শিল্পের জন্যই আরো অধিক সুফল বয়ে আনত। তিনি আরো বলেন, "শ্রমিকদের খুবই নিম্ন মানের খাদ্য ভাতা দেয়া হয় ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তা উৎপাদনকে ব্যাহত করে, যদিও এই সমস্যাগুলো খুব সহজেই সমাধানযোগ্য।"

এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি সাজানো হয়েছে বিশেষ করে চা শ্রমিকদের মানসিকতার উন্নয়ন ও তাদের অধিকার ও ন্যায়বিচারের পুর্নভাবনার উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ফিলিপ গাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিমুদ্দিন খান, এই প্রতিবেদনের লেখক এবং ফিলিপ গাইন অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, কেসস্টাডি, জরিপ এবং ফলিত গবেষণার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা চা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন তৈরি ও লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার প্রচন্ড উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে ১১ ফেব্রুয়ারি এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটির সমাপ্তি ঘটে। *মো: আশরাফুল হক*

চা বাগানের লাইন চৌকিদার শ্যাম সুন্দরের জীবন

মৌলভীবাজারের লাংলা চা বাগানে কঠোর নিয়ম কানুনে আবদ্ধ লাইন চৌকিদার শ্যাম সুন্দরের (৪২) জীবন। ব্রিটিশ কর্পোরেশন ক্যামেলিয়া পিএলসির অধীন ডানকান ব্রাদার্স (বাংলাদেশ) এ চা বাগানের মালিক। তিনি রবিদাস জনগোষ্ঠির মানুষ যাদের আদি নিদর্শন পূর্ব ভারতে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রায় ১৫০ বছরেরও অধিক সময় পূর্বে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রনাধীন চা বাগানে কাজ করার জন্য চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে তাদেরকে এদেশে নিয়ে আসা হয়। তিনি তার ভাইয়ের সাথে পরিবারের আরো আট সদস্যসহ ম্যাজেন্টা লেবার লাইন নামে পরিচিত চা বাগানের আবাসিক এলাকায় তার পরিবারের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গায় বসবাস করেন। উক্ত লেবার লাইনের ছয়শত সদস্যের মধ্যে তিনি একজন যাদের জীবন ও ভাগ্য চা এবং রাবার বাগানে দিনমজুর হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে খুবই স্বল্প আয়ের উপর নির্ভরশীল। একজন লাইন চৌকিদার হিসেবে ২৪ ঘন্টা কর্তব্যরত অবস্থায় থেকেও শ্যামসুন্দর মাত্র ৬৯ টাকা দৈনিক মজুরি পান যা ৮ ঘন্টা কাজ করা চা বাগানের অন্যান্য শ্রমিকের দৈনিক মজুরির সমান। তিনি ১৮ বছর বয়স থেকে চা বাগানে কাজ শুরু করেন এবং ৬০ বছর বয়সে এ কাজ থেকে অবসর নেবার সময় তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে বলে তিনি মনে করেন না।

লাইন চৌকিদার হিসেবে তাকে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠার পাশাপাশি তার লেবার লাইনের সকল চা শ্রমিককে কাজের জন্য প্রস্তুত করা এবং ঐ দিন কে কোথায় রিপোর্ট করবে তা নিশ্চিত করতে হয়। তাকে তার লেবার লাইনের উপরে যে কোনো ধরনের সমস্যা, ব্যবস্থাপনাগত বিষয়, আইনভঙ্গ কিংবা যে কোনো অপরাধের জন্য প্রশাসনকে অভিযোগপত্র প্রদান করতে হয়।

বিপত্নীক শ্যামসুন্দর, যার স্ত্রী ১৬ বছর পূর্বে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, চা বাগানের বিয়োগান্তক ও মর্মান্তিক বাস্তবতার সাথে খুবই পরিচিত। ১৭-২৪ বছরের ভিতর ২ মেয়ে ও ২ ছেলের কথা চিন্তা করে তিনি পুনরায় বিয়ে করেননি। তিনি তার ২৫ বছর বয়সী চাচাতো ভাইকেও ক্ষতরোগে মারা যেতে দেখেন যাকে আরেকটু উন্নত ও সময়োপযুগী চিকিৎসা দিতে পারলে বাচাঁনো যেত বলে তিনি মনে করেন।

শ্যাম সুন্দর। ছবি ফিলিপ গাইন

তিনি প্লান্টেশন এলাকর ভীতিপূর্ণ অবস্থার কথা অকপটে স্বীকার করেন। চা শ্রমিকরা আশপাশের বাঙালিদের থেকে জাতীগতভাবে ভিন্ন ফলে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার অভাবে এরা প্রতিনিয়তই শোষণ এবং প্রতারিত হবার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। পূর্বে দেখা গেছে, যে সমস্ত বাঙালিরা বাগানের চারপাশে বসবাস করে তারা চা শ্রমিকদের বিভিন্ন জিনিস চুরি করে নিয়ে যায় এবং স্কুলে যাওয়া আসার পথে চা শ্রমিকদের মেয়েদেরকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে। তারা জানে যে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতিকারের বেলায় তাদের প্রতি খুব একটা সুবিচার করা হয় না এবং তারাও তা মেনে নিয়েছে।

শ্যামসুন্দর খুবই কষ্টের সাথে বলেন, "আমি একদিন খুবই আরাম দায়ক বিছানায় ঘুমানোর স্বপ্ন দেখি কিন্তু এজন্য আমাকে দুই হাজার টাকা খরচ গুনতে হবে যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ফলে সে তার জন্য খুবই সাদামাটা জীবন বেছে নিয়েছে। তিনি আজ রাত আবারো কিছু সুখ স্বপ্ন নিয়ে তার বিছানায় ঘুমাতে যাবেন এবং আগামীকাল সকালে কেনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই আরো একটা নতুন দিন শুরু করবেন। *আসফারা আহমেদ*

সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিপীড়ন প্রতিরোধ বাংলাদেশের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রধান চ্যালেঞ্জ

আদিবাসীদের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা নিজস্ব জীবন প্রণালী, ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। কিন্তু বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন ও রাজনৈতিক নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড এসবের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে যা স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্বকে ক্রমেই হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) আয়োজিত এক আবাসিক কর্মশালায় বাংলাদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে বক্তারা এসব কথা বলেন।

'বাংলাদেশের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার বিষয়ে গবেষণা ও পুনর্ভাবনা' শীর্ষক চার দিন ব্যাপী এক কর্মশালা গত ২২-২৫ মার্চ দিনাজপুরের পার্বতীপুরের গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিক, উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মী এবং বিভিন্ন স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর (সানতাল, ওরাও, মুণ্ডা, রাজোয়ার, হদি, পাহাড়িয়া, গাড়ো, মাহালে, কোচ) প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' এ বাংলাদেশে ২৭টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও আদিবাসী সংগঠন, নৃবিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতে এ সংখ্যা আরোও অনেক বেশি। পরিবেশ ও আদিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)। সেডের নিরীক্ষায় দেখা যায় বাংলাদেশে এই ২৭ টি জাতিগোষ্ঠীসহ ৯০টিরও অধিক স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে যাদের অধিকাংশ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, উত্তর-মধ্যাঞ্চল ও চা-বাগান এলাকায় বাস করছে। অথচ এই জাতিসত্ত্বার মানুষের নেই কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও নাগরিক অধিকার। স্বল্প-পরিচিত এই জাতিসত্ত্বার মানুষরা আইনি বৈষম্যের পাশাপাশি স্থানীয় বাঙালি জনগোষ্ঠীর দ্বারা নানা ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাঙালিরা আদিবাসীদের ভূমি দখল করছে। ২০১১ সালে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সকল মানুষকে 'বাঙালি' হিসেবে পরিচিতি দেওয়ার ফলে আদিবাসীদের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় হুমকির তৈরি হয়েছে। পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসেবে আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের আত্মপরিচয়, সামাজিক অবস্থান, মানবাধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি বর্তমানে চরমভাবে হুমকির সম্মুখীন।

স্বল্প-পরিচিত এই জাতিসত্ত্বার মানুষের অধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার, মনের বিকাশ ও চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করাই ছিল কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া মাঠ গবেষণা এবং তথ্যের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, মাঠ জরিপ ও প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল নিয়ে আলোচনা, রিপোর্ট ও কেস স্টাডি অনুশীলন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়সমূহ, বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন, ভাষা এবং সংস্কৃতির পরিচয় ও হুমকি বিষয়েও কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। 'বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের মানচিত্রায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক তিন বছর মেয়াদি এক প্রকল্পের আওতায় সেড 'বাংলাদেশের স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার বিষয়ে গবেষণা ও পুনর্ভাবনা' শিরোনামে এ কর্মশালার আয়োজন করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, "উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীরা অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে। আদিবাসী ইস্যুতে অল্প কিছু মানুষ ছাড়া সবাই আমাদের বিপক্ষে। আদিবাসীদের ভূমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে এমনকি

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ।

তাদের ইজ্জতের ওপর হামলা হচ্ছে। সর্বত্র আতঙ্ক ও ভীতি ছড়িয়ে থাকার কারণে আদিবাসীরা প্রতিবাদের ভাষাও হারিয়ে ফেলছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোন ভূমিকাই পালন করছে না।"

ভূমি সমস্যা উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের প্রধান সমস্যা। বছরের পর বছর ধরে প্রভাবশালী বাঙালিরা আদিবাসীদের জমি অবৈধভাবে দখল করে তাদেরকে জোর করে ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করছে। এক্ষেত্রে প্রশাসন ও সরকারের অসহযোগিতার কথা উল্লেখ করে জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, "দিনাজপুরে আদিবাসীদের সবচেয়ে বেশি জমি দখল করেছে আওয়ামী লীগের লোকজন। আদিবাসীদের ভূমির তিনভাগের দুই ভাগই আজ রাজনৈতিক নেতাদের দখলে। অবস্থাটা এমন দাড়িয়েছে যে তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলাও যাচ্ছে না। প্রশাসনও এ বিষয়ে নির্বাক ভূমিকা পালন করছে।"

কর্মশালার দ্বিতীয় দিন অংশগ্রহণকারীরা ৫টি দলে বিভক্ত হয়ে দিনাজপুরে বসবাসকারী ৫টি স্বল্প-পরিচিত জাতিগোষ্ঠীর (করা, তুরি, মুশহর, মুণ্ডা ও ঘাটুয়াল) গ্রাম পরিদর্শন করেন। গবেষণা কর্মশালার অংশ হিসেবে গ্রাম পরিদর্শন শেষে প্রতিটি দলের অংশগ্রহণকারীরা নির্দিষ্ট জাতিসত্তার ওপর রিপোর্ট, কেস স্টাডি ও প্রোফাইল লিখেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী উত্তরাঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার আন্দোলনের নেত্রী বিচিত্রা তির্কি বলেন, "শিক্ষার অভাবে আদিবাসীরা সবক্ষেত্রেই পিছিয়ে রয়েছে। শুধুমাত্র লাঠির জোরে অধিকার আদায় করা যায় না, এজন্য দরকার কলমের শক্তি।"

বাংলাদেশের আদিবাসীদের জীবন, ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর হুমকি বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বখতিয়ার আহমেদ বলেন, "বাংলাদেশের আদিবাসীদের সবচেয়ে বড় হুমকি তাদের ভাষা হারিয়ে যাবার ভয়। বাংলা ভাষার প্রভাব ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের ভাষা সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় অনেক জাতিগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষা হারিয়ে ফেলেছে। আর কোন জাতির ভাষাকে যদি শেষ করা যায় তাহলে তাকে আর আলাদা করে হত্যার দরকার হয় না।"

একটি জাতির মাতৃভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে সীল বাংলাদেশের ভাষা ও শিক্ষা কর্মকর্তা ক্লারা টুম্পা বাড়ে বলেন, "নিজস্ব ভাষার চর্চা না করে আদিবাসীরা যদি শুধু বাংলা বা ইংরেজি ভাষার দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে একটা সময়ে আদিবাসীদের নিজেদের ভাষার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আদিবাসীরা তখন বাঙালিদের সাথে মিশতেও পারবে না আবার নিজের ভাষাতে ফিরেও আসতে পারবে না। ইতিমধ্যে আদিবাসীদের অনেকের ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

চারদিনের কর্মশালায় সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন সেডে'র প্রধান নির্বাহী ফিলিপ গাইন। কর্মশালায় মাঠ গবেষণা এবং প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের কৌশল বিষয়ে তার পাশাপাশি আরও আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তানজিমউদ্দিন খান। অংশগ্রহণকারীদের মাঠ পরিদর্শনের পর তৈরি কেস স্টাডি ও রিপোর্ট লেখার অনুশীলন এবং প্রতিবেদন উপস্থাপনের নানা কৌশল নিয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস এবং ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে।

সেড আয়োজিত চারদিনের এই কর্মশালা শেষে স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার মানুষসহ সকল অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা স্বল্প-পরিচিত জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম, নাগরিক অধিকার, তাদের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার উৎসাহ এবং গবেষণা, রিপোর্টিং ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কীভাবে বিলুপ্ত প্রায় স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব রক্ষায় কাজ করা যায় সেই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে নিজ নিজ জাতিগোষ্ঠীর কাছে ফিরে গেছেন।

মো: রাজিবুল হাসান

একটি উচ্ছেদ ডিক্রি, তার বাস্তবায়ন এবং সাতটি মাহালে পরিবারের দুর্ভাগ্য

রাজশাহীর তানোর উপজেলার ছোট্ট মাহালি গ্রাম পাচন্দর। ১৭ই মার্চ খুব সকাল বেলা যখন সেখানে পৌঁছি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। মনে হয় যুদ্ধবিধ্বস্ত কোনো জনপদ দেখছি। মোটা মাটির দেয়ালের উপর টিনের চালের ঘরগুলো গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ধান-চাল, ঘরের আসবাবপত্র, বিছানা, কাপড়-চোপড়, এবং ঘরের অন্যান্য সামগ্রী ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া ঘরের মাটির সাথে মিশে আছে। যেসব পরিবারের ঘর ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে তারা আজ নিঃস্ব। তারপরও তারা ভিটে ছাড়েনি। গুড়িয়ে দেয়া ঘরগুলো আগলে আছে। সবার এক কথা অন্যায়ভাবে তাদের ঘরগুলো ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তারা ন্যায় বিচার চায়।

নিজের বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাড়িয়ে পাচন্দর গ্রামের একজন মাহালে মহিলা। ছবি: ফিলিপ গাইন

আদালতের এক উচ্ছেদ ডিক্রি নিয়ে সাতটি মাহালে পরিবারের ঘরগুলো যেখানে গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে ৩২ শতক অর্পিত সম্পত্তির উপর

তারা শতবর্ষ যাবৎ বসবাস করছে।

প্রতিবেশী সাদিপুর গ্রামের তিন ভাই ফজলুর রহমান, এস্তাব আলী, ও আনিসুর রহমানের দাবি তারাই ঐ জমির মালিক। তিন ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠতম আনিসুর রহমান (৬৫) বলেন, "আমরা সাবের আলী মন্ডলের কাছ থেকে ৮৪ নং দাগের ৩২ শতক জমি কিনেছি। মাহালেদের ঘর ভেঙ্গে আমরা অন্যায় কিছু করিনি, আমরা মামলায় জিতেছি এবং আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। পুলিশ এবং আদালত অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে আমাদের সহযোগিতা করেছে মাত্র।"

"এটি খুবই ন্যাক্কারজনক," বলছিলেন মুন্ডুমালা পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ওমর ফারুক যিনি ঘরগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়ে ব্যর্থ হন। তিনি আরো বলেন, "সাতটি মাহালে পরিবার ২০১৩ সালে সর্বশেষ বাৎসরিক লিজ (ডিসিআর) নিয়েছে, তার মানে এদের লিজ হালনাগাদ।"

মাহালে পরিবারগুলোর একেবারেই পাশ ঘেষেই দাগ নং ৯৪ এর উপর দুইটি কর্মকার পরিবারের ঘরও আংশিক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে।

উচ্ছেদ অভিযান

পরিবারের ৮ সদস্যসহ বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে বসবাসরত যোহন হাঁসদা (৬৫) উচ্ছেদের দিনের (৩০ মার্চ ২০১৪) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "সকালে কয়েক জন পুলিশসহ একটি মাইক্রোবাস এসে আমাদের গ্রামের সামনে থামে। তারা মুলত ফজলুর রহমান, এস্তাব আলী এবং আনিসুর রহমানসহ আরো প্রায় ১৫০ জন মানুষ যারা এই ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছিল। এর কিছুক্ষণ পর তানোর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে আরো ২টি পুলিশের গাড়ি এসে উপস্থিত হয়। অতঃপর তারা আমাদের কান্না উপেক্ষা করে আমাদের ঘরগুলো ভাঙ্গতে শুরু করে।"

নিজের ঘরের ধ্বংসস্তুপের মাঝে দাঁড়িয়ে জাস্টিনা হেমব্রম (৩৫) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ৩০ মার্চ-এর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "আমরা মাঠে গম কাটার কাজ করছিলাম। যখন শুনলাম যে আমাদের বাড়ীঘর ভাঙ্গা হচ্ছে, তখন আমরা দৌড়ে গ্রামে এসে দেখি প্রায় ৩৫ জন লোক মিলে আমার ঘর ভাঙ্গছে। তাদেরকে আমার ঘর না ভাঙ্গতে আকুতি জানাই। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার কী করা উচিত। আমি তাদের কাছে কয়েকদিন সময় ভিক্ষা চাই। কিন্তু তারা সেদিকে কোনরূপ ভূক্ষেপ না করে আমার ঘর ভাঙতে থাকে।"

জাস্টিনা আরো বলেন, "তারা আমাদেরকে ঘরের ধান, চাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র বের করারও সময় দেয়নি। পরে আমি আমার ৪ বস্তা ধান, ২ বস্তা গম এবং ২ কুঠি (খাবার সংরক্ষণের জন্য মাটির তৈরি পাত্র) চাল মাটির সাথে মিশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় পাই।" এরমধ্যে সে পাথর নিক্ষেপের ফলে আঘাতপ্রাপ্ত তার স্বামীর ভাইয়ের ১০ বছরের মেয়ে স্মৃতিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে কিনা স্থানীয় এক হাসপাতালে তিন ঘন্টা অচেতন অবস্থায় ছিল।

নিজের ঘর ভাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী আরেক নারী সিসিলিয়া হাঁসদা (৩৫) ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "আমি তখন মাঠে কাজ করছিলাম যখন আমাদের বাড়ীঘর ভাঙ্গার খবর আসে। আমি ছুটে আসি গ্রামে। হতবাক হয়ে দেখি ২০ জনের মত মানুষ আমার মাটির দেয়ালের উপর টিনের ছাদ দেয়া ঘরটি ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে।"

সিসিলিয়া আরো বলেন, "গোলাপ নামক আদিবাসী নারী সংগঠনের হিসাব রক্ষক আমি। আমার ঘরে জমা ছিল এ সংগঠনের ১৪ মন, গম, ৪ মন সরিষা এবং নগদ ৫ হাজার টাকা। এছাড়াও আমার নিজের আরো ২০ মন ধান ছিল। আমি তাদের কাছে আমাকে ঘরে যাবার মিনতি জানাই, কিন্তু তাতে তারা কর্ণপাত করেনি। আমি অসহায়ভাবে আমার ঘরটিকে মাটির সাথে মিশে যেতে দেখি। আমার ঘরের সাথে গচ্ছিত খাদ্যশস্য ও টাকা সবই ধুলায় মিশে গেল। সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ চলে এ ধ্বংসযজ্ঞ। "

যে বিষয়টি মাহালে ও তাদের প্রতিবেশীদেরকে আরো বেশি অবাক করে তা হলো ২০১৩ সালের এই উচ্ছেদ ডিক্রি বাস্তবায়নের ব্যাপারে আদালত তাদের কোনো নোটিশ দেয়নি।

তানোর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এবং আদালত প্রতিনিধি (এডভোকেট কমিশন, জরিপকারী এবং নাজির) সকলেই মাহালেদের সকল প্রকার অনুরোধ উপেক্ষা করে। এ বিষয়ে ওসি এস. এম. বজলুর রশিদ বলেন, "আমরা আদালতের একটি ডিক্রি বাস্তবায়নে সহায়তা করেছি মাত্র।" অভিযোগ আছে মাহালেদের সাথে যেসব বাঙালি বাড়ীঘর না ভাঙ্গার অনুরোধ করেন তাদেরকে গ্রেফতার করার হুমকি দেয়া হয়।

বেশ কিছু সামাজিক সংগঠন পরদিন (৩১ মার্চ ২০১৪) এই উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ মানব বন্ধন এবং অবরোধ কর্মসূচী পালন করে। পরবর্তীতে ২১ এপ্রিল রাজশাহী জেলার জেলা প্রশাসক মেসবাহ উদ্দিন চৌধুরী পাচন্দর গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ক্ষতিগ্রস্থ ৩টি পরিবারকে তিন হাজার টাকার করে চেক প্রদান করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্থ ৯টি পরিবারের প্রত্যেককে তিন হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা ও ৩০ কেজি করে চাল দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

জেলা প্রশাসক এও নিশ্চিত করেন যে, পাচন্দর গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ আদিবাসী পরিবারগুলো যে ৩২ শতাংশ জমির উপর বসবাস করছে তা অর্পিত সম্পত্তি। পাচন্দর পরিদর্শনকালে তিনি আরো বলেন, "এ জমি সরকারের সম্পত্তি এবং আমরা এই ডিক্রির বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করব।"

জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ সরেন বলেন, "পাচন্দর গ্রাম পরিদর্শন এবং কিছু অর্থ ও খাদ্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য আমরা রাজশাহী জেলা প্রশাসককে অভিনন্দন জানাই। এর মাধ্যমে কিছুটা স্বস্তি এসেছে। কিন্তু আমাদের দাবি সাতটি মাহালে পরিবার যে জায়গায় দীর্ঘ সময় ধরে বসবাস করে আসছে তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসিত করা হোক। তিনি আরো বলেন "আমরা চাই জেলা প্রশাসকের কার্যালয় খুব দ্রুত এই ডিক্রির বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করুক এবং এই জমিতে মাহালে পরিবারগুলোকে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করুক। কারণ সত্যিকার অর্থেই এই জমিগুলোর প্রকৃত কোনো মালিক নেই।"

একটি মাহালে পরিবারের প্রধান যোসেফ মাংরা মুর্মু বলেন, "আমরা এই ত্রাণ গ্রহণ করছি কিন্তু আমাদের প্রধান দাবি আমাদের ঘরগুলো পুনঃনির্মাণ করে দেয়া এবং এই জমিতে আমাদেরকে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করা।"

ফিলিপ গাইন

দিনাজপুরে সান্তাল গ্রামে হামলা

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলার বুলাকিপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর সান্তাল গ্রামে ২০১৩-এর ৬ জুন শতাধিক বাঙালি হামলা ও লুটপাট চালায়। একটি আম বাগানের জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দের জের হিসেবে এই হামলার ঘটনা ঘটে। খ্রিস্টান অধ্যুষিত আদিবাসী গ্রামটির অনেকেই হামলার পর গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। যারা গ্রাম ছাড়েনি তারা পুনরায় হামলার আশঙ্কা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

রঘুনাথপুরের পার্শ্ববর্তী ভিলাইন গ্রামের আজিজার প্রধানের ছেলেরা বিরোধপূর্ণ বাগান থেকে আম পাড়ার অভিযোগে নিকোলাস মুরমু ও তার ভাতিজা রাবন মুরমুকে স্থানীয় কানাগারি বাজারে আটকে রেখে পিটুনি দেয়। এক ঘন্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিকোলাস ও রাবনকে উদ্ধার করে বুলাকিপুর মিশন সেন্টারে পাঠিয়ে দেয়।

আজিজার প্রধানের দাবি, নিকোলাসের বাবা হোপনা মুরমুর কাছ থেকে ৩.০৬ একর জমিটি তিনি ক্রয় করেছেন। দিনাজপুরের অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের (রাজস্ব) আদালতে জমি সংক্রান্ত এ বিরোধ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

ছবি: ফিলিপ গাইন

নিজের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের মাঝে দাড়িয়ে সিসিলিয়া হাসদা।

বিরোধপূর্ণ জমির উপর আম বাগান। ছবি: মো: আশরাফুল হক

আজিজার প্রধান ও তার লোকজন একই দিন সকাল ১০ টায় পুলিশের উপস্থিতিতে বাগানে আম পাড়তে শুরু করে। এক পর্যায়ে নিকোলাসের ভাই খোকা মুরমু বেশ কিছু সান্তাল লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছলে দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে আজিজার প্রধানের ভাতিজা মুরশিদুল আলম ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং উভয় পক্ষের বহু মানুষ আহত হয়।

নিহতের বড় ভাই মাহবুবুল আলম নিকোলাস মুরমুসহ সাত জনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগে ঘোড়াঘাট থানায় একটি মামলা (মামলা নং-৩; তারিখ-০৬/০৬/২০১৩) দায়ের করে। আলমের দাবি, মুরশিদুলের বুকে ও অণ্ডকোষে আঘাত করা হয়েছিল। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনেও গলা চাপা পড়া ও অণ্ডকোষে আঘাতের কারণে মুরশিদুলের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মুরশিদুলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ভিলাইন গ্রামের শত শত বাঙালি একত্রিত হয়ে রঘুনাথপুর গ্রামের সান্তাল পাড়া — বাগজাপাড়া, টিভিপাড়া ও দিঘিপাড়ায় হামলা চালায়। হামলাকারীরা গ্রামগুলো থেকে ৮০টি গবাদিপশু, শত শত কেজি চাল ও অন্যান্য ফসল লুট করে। তারা বিনা অনুমতিতে বুলাকিপুর মিশন সেন্টারে ঢুকে সান্তালদের আশ্রয় দেয়ায় চার্চের সেমিনারিয়ানদের হুমকি প্রদান করে।

হত্যার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সাত সান্তালকে ৬ জুন (২০১৩) জেলে ঢোকানো হয়। ২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জামিনে মুক্ত হন তারা। আবার তাদের জেলে ঢোকানো হয় ১১ এপ্রিল। এর মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক একজনকে জামিনে মুক্তি দেয়া হলেও বাকি ৬ জন এখনো (মে ২০১৪) জেলে আছে। সান্তাল গ্রাম ও মিশনে হামলার অভিযোগে টিভিপাড়ার শানতি কিসকু (মামলা নং-৭; তারিখ-১১/০৬/২০১৩) ও ফাদার আনসেলমো মারডি (পেনাল কোর্টের মামলা নং-৬; তারিখ-৮/৬/২০১৩) দুটি পৃথক মামলা দায়ের করলেও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

ঘটনার পর থেকে সান্তালদের নিরাপত্তার জন্য ৩০ সদস্যের একটি পুলিশ ব্যাটেলিয়ান নিয়োজিত করায় আদিবাসী পরিবারগুলোতে কিছুটা স্বস্তি আসে। মিশনের ডরমিটরিতে পুলিশ অস্থায়ী শিবির স্থাপন করে গ্রামের নিরাপত্তা দেয়। এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় লুট করে নেয়া অধিকাংশ গবাদিপশু আদিবাসী পরিবারগুলোতে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তরা সংঘর্ষের তিন দিন পর ৯ জুন এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও নিকোলাস মুরমুর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এলাকার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চাইলে ৭ মে ২০১৪ বুলাকিপুর মিশন সেন্টারের ফাদার জেরম (৬০) জানান, এলাকার নিরাপত্তায় গত ১১ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত পুলিশ ক্যাম্প ছিল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর হামলাকারীরা আবারও আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে। তারা সান্তালদের জমির ধান কেটে নিবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। ফলে ৭০টি সান্তাল পরিবার দুষ্কৃতকারীদের হামলা আতঙ্ক নিয়ে দিনযাপন করছে।

টিভিপাড়া গ্রামের মিস্ত্রি মুরমু (৬৫) বলেন, “হামলার ভয়ে আমরা বাজারে কেনাকাটা করতে যেতে পারছি না”। হামলার ভয়ে উদ্বিগ্ন একই গ্রামের রাজনি হাজদা (৩৫) বলেন, “তারা আবারও আমাদের বাড়ি হামলা করতে পারে”।

সান্তালদের উপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ দিনাজপুর শহরে একটি মানববন্ধন করে। পাশাপাশি আদিবাসী ও তাদের ভূমির সুরক্ষা এবং হামলাকারীদের শাস্তির দাবিতে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও পুলিশ সুপার (এসপি) বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেন।

মো: আশরাফুল হক এবং জোসেফ হাজদা

চন্দনা ভুঞ্জর: এক কাদর নারীর প্রান্তিক জীবন

চন্দনা ভুঞ্জর (২৫) দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় ১০ নং রানীপুকুর ইউনিয়নের গিরিডোবা গ্রামে কাদর নামক ছোট্ট সম্প্রদায়ের একজন কৃষি দিনমজুর হিসেবে খুবই অসহায় জীবন যাপন করে। তিনি ভূমিহীন, হতদরিদ্র এবং ছোট কাদর সম্প্রদায়ের একজন সদস্য যাদের আদি নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের ভাষা হিন্দি ও বাংলা এবং তারা কারাম ধর্মের অনুসারী। একটি স্বতন্ত্র ও অল্প পরিচিত সংস্কৃতির মানুষ হিসেবে তারা তাদের প্রতিবেশী বাঙালি মুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

চাষাবাদের ভরা মৌসুমে ধানক্ষেতে কাজের মাধ্যমে চন্দনা দৈনিক ১৫০ টাকা (২ মার্কিন ডলার) আয় করে। এই গ্রামেই জন্ম গ্রহন করা চন্দনা পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সেই একমাত্র সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তার অন্য চার ভাইরা খুব কম বয়স থেকেই পরিবারের উপার্জনে সহযোগীতার জন্য কাজে যোগ দিতে হয়েছে বলে তারা চন্দনার মত পড়াশোনা করার সুযোগ পায়নি। পড়াশোনার প্রতি অত্যধিক উৎসাহ এবং ইংরেজী, বাংলা, গণিত ও সামাজিক অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সে তার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে

পারেনি। চন্দনা অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলেন "আমি আরো পড়াশোনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার বাবা মা আমাকে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয় ফলে আমার ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।"

চন্দনা ও তার স্বামী বর্তমানে তার পিতামাতা সহ পরিবারের আরো ১৩ জন সদস্যের সাথে গ্রামের ছোট্ট এক কোনায় একটি জরাজীর্ণ মাটির ঘরে বসবাস করে। মৌসুমী বেকারত্ব তাদের সম্প্রদায়ের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা। সেপ্টেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত কৃষি কাজের অপর্যাপ্ততার ফলে তাদের পরিবারকে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ধরনের আয় ব্যাতীত অথবা খুব কম আয়ের ফলে খুবই কষ্ট সহ্য করতে হয়। এ বিষয়ে চন্দনা বলেন "এ সময়ে বেশির ভাগ দিনই আমাদেরকে একবেলা খেয়ে দিন পার করতে হয়।" ফলে দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য তাদেরকে ঋণের জন্য অন্যের দারস্থ হতে হয়।

আসন্ন মৌসুমী ঝড়গুলোও তাদের পরিবারের জন্য আরো একটি দুশ্চিন্তার কারন। বাড়ী ঘরের ছাদ পুনর্নিমানের জন্য অর্থের অপ্রতুলতার ফলে কাল বৈশাখী ঝড়ের কারনে তাদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। যাই হোক, এটি হচ্ছে তাদের জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী অনেকগুলো ঝড়ের একটি যার ফলে তাদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পাশাপাশি নানা ধরনের দুঃখ দুর্দশা সহ্য করতে হয়।

আসফারা আহমেদ

চন্দনা ভুঞ্জর। ছবি: ফিলিপ গাইন

নোটিশ বোর্ড

গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজে অংশগ্রহণের জন্য আহবান

"বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের উপর মানচিত্রায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের একটি মুল কাজ বাংলাদেশের চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অবস্থা এবং তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন নিয়ে গবেষণা, ভৌগোলিক মানচিত্র তৈরি এবং অনুসন্ধান। এই কাজে নিয়োজিত গবেষণা দলসমূহ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), সাক্ষাৎকার ও জরিপের মাধ্যমে চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের উপর গবেষণা এবং নানামুখি অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ২০১৩ সালের মে মাসে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির এক বৎসর পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে আমরা গবেষণা, অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণধর্মী কাজে শিক্ষক, লেখক এবং সাংবাদিকদেরকে সংযুক্ত করার প্রত্যাশা করছি।

গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে চা শিল্প এবং প্রকল্পাধীন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমুহের ভুমির অধিকার, শ্রম আইন এবং চা শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত শ্রম আদালত (১ ও ২), রাষ্ট্র এবং চা বাগান মালিকদের কল্যাণমূলক উদ্যোগ, চা শিল্পে শোভন কর্ম পরিবেশ এবং মজুরি, চা শ্রমিক এবং সমতল ভূমির জাতিসত্ত্বাসমূহের খাদ্য নিরাপত্তা, আদিবাসীদের ভাষা এবং সংস্কৃতি, চায়ের উৎপাদন খরচ এবং নিলাম মূল্য, চা বাগান এবং অন্যান্য যে সমস্ত জায়গায় ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার বসবাস সে সমস্ত এলাকায় পরিবেশগত হুমকি, চা শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষা, চা শিল্পে বেকারত্ব, চা বাগান এবং সমতলের আদিবাসীদের আন্দোলন-সংগ্রাম, চা শ্রমিক এবং স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের প্রয়োজন, প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সনদ এবং জাতীয় আইনসমূহ

পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীসমুহের অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি রাজনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান এবং কর্মস্থলে শোভন পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নানাবিধ সনদ এবং জাতীয় আইন বিদ্যমান রয়েছে। এই সমস্ত আইন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, কর্পোরেট এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আইনগত বাধ্যবাধ্যকতা এবং দায়িত্ব কেমন হবে তা নির্ধারন করে দেয়। এসব সনদ এবং আইনের মধ্যে অন্যতম:

আন্তর্জাতিক

- আদিবাসী এবং ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৫৭ (নং ১০৭)।
- আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত কনভেনশন, ১৯৮৯ (নং ১৬৯)।
- আদিবাসী অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা ২০০৭।
- জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৫৭ (নং ১০৫)।
- সংগঠিত হওয়া এবং কালেক্টিভ বারগেইনিং-এর অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (নং ৯৮)।
- সার্ক সোশাল চার্টার (২০০৪ সালের ৪ জানুয়ারি গৃহিত)।

জাতীয়

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬।
- দি ইস্ট বেঙ্গল স্টেইট অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট ১৯৫০।
- অর্পিত সম্পত্তি আইন।

চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে এই সমস্ত আইনে কী বলা আছে এবং বাংলাদেশে এগুলো বাস্তবায়নের চিত্র কী তা জানার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিদের যে কোন ধরনের পরামর্শ দেয়ার আহবান জানাচ্ছি। এসব সনদ বিশ্লেষণ এবং গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী শিক্ষক, গবেষক এবং সাংবাদিকদেরকে আমরা যোগাযোগের আহবান জানাচ্ছি।

প্রশিক্ষণ এবং সংলাপ পঞ্জিকা (২০১৫ এর এপ্রিল পর্যন্ত)

- চা শ্রমিক ও স্বল্প-পরিচিত জাতিসত্ত্বাসমূহের ব্যাপারে আগ্রহী সাংবাদিকদের জন্য প্রশিক্ষণ, আগস্ট ২০১৪।
- চা বাগানের শ্রমিক নেতা এবং শ্রমিক সংঘের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশিক্ষণ, সেপ্টেম্বর ২০১৪।
- শ্রীমঙ্গল, দিনাজপুর/রাজশাহী এবং ঢাকায় মোট ৩টি সংলাপ; অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ২০১৪।
- চা শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার মধ্য থেকে নির্বাচিত নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ, মার্চ ২০১৫।